র ঙ বা হা র

সজল ঘোষ

স্যার, বেড়াতে যাবেন নাকি? পাহাড়ের ওদিকে?

সনৎসূর্য নির্বাক। প্রশ্ন কিছু শুনতে পেল কিনা বোঝা গেল না। লম্বা ফালি রোদটুকু তেরছাভাবে থামগুলোর আড়াল পেরিয়ে গায়ে এসে পড়েছে। চোখের দৃষ্টি ওপরের দিকে। কয়েকদিন হয়ে গেল আকাশটা ঘোলাটে মেরে আছে। এতটাই, যে চারপাশের সবকিছুই যেন বর্ণহীন। কোথা থেকে মাঝে মাঝে নিম্নচাপ সরে সরে আসে, বৃষ্টি হবে কি হবে না, তেমন কোনো গ্যারান্টি নেই অথচ সমস্ত উত্তুরে হাওয়াটা নাকি তার জন্যই থম মেরে গেছে। সামনের পাহাড়টাও কেমন তাই একেঘেয়ে ঠেকছে সনৎসূর্যের। একেবারেই ভাবতে চাইছে না কালো কালো বেরিয়ে থাকা ভাঙাচোরা পাথরগুলো কথা। দত্ত নাছোড়বান্দা। হাসি হাসি মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, একইভাবে বহুক্ষণ। গা ঘিনঘিন করে ওঠে সনৎসূর্যের। বিশ্রী রকমের মাড়ি বার করা এইসব মুখগুলো দিকে তাকালেই তার কেঁচোর কথা মনে হয়। কোনও সংশ্রব নেই, তবু কেন যেন মনে হয়। উপায় নেই কিছু। এমন মেরুদণ্ডহীন একটি প্রাণীর দেখভাল নিয়েই আপাতত তাকে দিন তিনেক বাঁচতে হবে।

—চমৎকার লাগবে স্যার। একটু ওপরেই গুহা আছে। সেখানে এক সাধু থাকেন। কাছেই শিবমন্দির। গাড়ি যাওয়ার রাস্তা আছে। এক ঘন্টার মধ্যে ঘুরে আসা যাবে।

একঘেয়ে ভঙ্গিতে দত্ত বলে চলেছে। উপায় না দেখে সনৎসূর্য অবশ্য অবস্থান বদলে ফেলেছে। তার এখন মনে পড়ছে সবুজ কাচের গেলাসটার কথা। কী সুন্দর উজ্জ্বল রং। হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল। ফস্কে গিয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। কাচের টুকরোয় ঘর ভরে যেতেই ঝিকঝিক করে উঠল চারপাশটা। সেইভাবেই বসেছিল অনেকক্ষণ। মুগ্ধ হয়ে দেখছিল সবুজ কাচের ধুলো। কোনো কোনো টুকরো মিহি হয়ে যেতে যেতে ধুলো হয়ে মিলিয়ে যেতে চাইছিল। সনৎসূর্য আজ প্রকাশ্য দিবালোকে, সবুজ রঙটার কথা ভাবছে। আজকাল মাঝে মাঝেই বিভিন্ন রকম রঙের কথা মনে আসে। কখনও কখনও জয়িতাকে জংলা শাড়ির মতো মনে হয়। সে কথা বললেই জয়িতা বিরক্ত হয়, সবসময়ে নয়। খুশিও হয় ফাঁকে ফোকরে, ছ্যাবলামিও মনে হতে পারে। অথচ সনৎসূর্য জংলা শাড়ির মধ্যে হরেক রং খুঁজে পায়। জয়িতাকে সে সব বলা যায় না। তার ভাবতে ভালো লাগে। হাওয়ার মধ্যে ব্রাশ চালায়। নানান রঙে হাওয়াটুকু ভরাতে পারলেই, পৃথিবীর সবখানটাই রঙের ছোঁয়া পায়। সনৎসূর্য এখন তাই সবুজ গেলাসটার কথা ভাবছে।

—এখানে তো আর কিছুই নেই স্যার। শুধু ঐ পাহাড়টা। চারপাশে যত ঘর দেখছেন সব বেঁচে আছে পাহাড়টার জন্য।

সনৎসূর্য কাচের গেলাসটা আবার তুলে রাখে। দত্তকেও তাড়ানো দরকার। ভীষণ আগ্রাসী মনে হয় দত্তকে। কালো মাড়ি বার করে তার মুহূর্তগুলোকে গিলতে চাইছে সেই থেকে।

—শুনুন ভাই, দত্ত। আমি পাহাড়ের ব্যাপারে খুব উৎসাহী নই। আজ বরং থাক।

—আসলে জানেন তো স্যার, এখানে আপনাদের মতো কোনো মহান এলেই গাঁয়ের লোকেরা আশা করে সে পাহাড়ে যাবে।

— কেন দত্ত?

— যেমন ধরুন, পাহাড়ে উঠতে গেলেই একটা রোড ট্যাক্স দিতে হয়। তারপর ধরুন শিবমন্দিরের পূজারি আছে, সে আশা করে পুজো দেবে কেউ। পাশে ফুল মিষ্টির দোকান, ওপাশে চায়ের দোকান। সব মিলিয়ে এপাশ সেপাশ কিছু পয়সা আসে স্যার।

— সে আমি এমনিই দিয়ে দেবো দত্ত।

— ছি ছি স্যার। আপনি দেবেন কেন? আপনি তো শুধু যাবেন। পয়সা কোম্পানি দিয়ে দেবে। সনৎসূর্য বিরক্ত হয়। দত্তর প্রস্তাবটাকে এবারে স্বার্থপর মনে হয়।

—আসলে কি জানেন স্যার, পাহাড়ের ওপাশেই একটা সুন্দর জঙ্গল আছে। অনেক হরিণ আছে, সম্বর আছে, নীলগাই আছে। আপনার ভালো লাগত স্যার।

— তোমার বাড়ি কোথায় দত্ত?

— আজ্ঞে, ঐ পাহাড়ের কাছেই।

— তুমি এখন সেখানেই চলে যাও। আপাতত সন্ধে পর্যন্ত তোমার বিশ্রাম।

দত্তর হাসি হাসি মুখটা এবার চুপসে যায়। সনৎসূর্য রেগে গেছে কিনা বুঝতে পারে না। কথার তালটা কীভাবে ফেরত পাওয়া যেতে পারে চিন্তা করে চুপ করে।

— আমি দুঃখিত স্যার, খুবই দুঃখিত। আসলে কি জানেন স্যার, আমি বোঝাতে চাইছিলাম, পাহাড়টা এখানে ভীষণই জীবন্ত। আপনি যদি পাহাড়ের দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকেন, পাহাড় আপনাকে ডাকবেই স্যার। আপনি পাহাড়ের ডাক জীবন্ত বুঝতে পারবেন স্যার।

সনৎসূর্য উঠে দাঁড়াল। আবার শরীরটা ঘিনঘিন করে উঠছে। পচা গন্ধ যেন নাকে এসে ঠেকছে। দত্তকে এখন ঐ কালো কালো পাথরগুলোর একটা মনে হচ্ছে। পেছন ফেরে এবং হাঁটা দেয় ঘরের দিকে। রিসর্টের এই ঘরটা বেশ বড়ো, অন্তত একজনের জন্য তো বটেই। সনৎসূর্য তবু অস্বস্তিতে থাকে। এ. সি মেশিন বসানো এই ঘরে চারপাশের শূন্যতা চেপে বসতে চায়। ফ্লোরোসেন্ট উজ্জ্বলতায় বাইরের পৃথিবীটা এখানে বর্ণহীন বদ্ধতায় অচঞ্চল। আজকাল সনৎসূর্যের ক্লান্তি আসে। পিঠখোলা মেয়েটি পড়েছিল বিছানার ওপর। হাতে তুলে নিল সে। উল্টেপাল্টে দেখতেই চোখ পড়ল বিউটি টিপ্‌স্‌। রাবিশ। সনৎসূর্য ছুঁড়ে ফেলে দিলে ম্যাগাজিনটা। টুংটাং করে বেজে উঠল ফোনটা।

— সনৎসূর্য বলছি।

— আপনি তো জানেন সনৎসূর্য, আজকাল সর্বত্রই সন্ত্রাস খুব বেড়ে গেছে।

— ইয়েস, ব্যানার্জী। এই অসামান্য সংবাদ জানানোর জন্য কি ফোন করলেন?

— খানিকটা তাই। আপনি এখন যেখানে আছেন, সে জায়গাটা খুব সেনসিটিভ।

— আমাকে বলা হয়েছে ব্যানার্জী।

— আমি জানি সনৎসূর্য। এতবড় দায়িত্ব নিয়ে গেছেন, সব তথ্যই তো আপনাকে জানানো উচিত।

— এবং জানানোও হয়েছে।

— সামনের পাহাড়টা দেখেছেন তো?

— এখানকার একমাত্র ট্যুরিস্ট স্পট?

— ওদিকটায় যাবেন না সনৎসূর্য। ওখানেই ওদের ডেন।

— আপনি জানলেন কীভাবে?

— সেটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট নয়। তথ্যটা আপনার জন্য।

— অনেক ধন্যবাদ ব্যানার্জী। নিশ্চিন্ত থাকুন।

— থ্যাঙ্ক য়ু সনৎসূর্য। মনে রাখবেন, আপনি কোম্পানির বিগেস্ট শেয়ার হোল্ডার। লাইনটা কেটে গেল। ব্যানার্জীর শেষ কথায় অবাক হল সনৎসূর্য। কী যে বোঝাতে চাইল। বসে রইল বেশ কিছুক্ষণ। আবার খুঁজতে থাকল যদি মেঝের কোথাও কোনো সবুজ কাচের টুকরো পড়ে থাকে। সকাল থেকেই সময়টা বিশ্রী কাটছে, মনে হল তার। দত্ত নিশ্চয়ই ফিরে গেছে, এই ভেবে ফের এসে দাঁড়াল বারান্দায়। ছড়ানো রোদ্দুর আবার কবে পাওয়া যাবে কে জানে। ভীষণ স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে হালকা কুয়াশার স্তর। শ্যাওলা হয়ে যেতে পারে কি শরীরে। সনৎসূর্য আবারও অবাক হল এমন বেসামাল কথা ভাবছে দেখে। সামনেই পাহাড়টা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। এখন আর অতটা অসহ্য মনে হচ্ছে না। দত্ত ধারে কাছে নেই বলেই কি। বরং চারপাশের সাজগোজের মাঝখানে পাহাড়টা বেশ অন্যরকম। খুব উঁচু নয়। ওপাশটায় জঙ্গলের আভাস পাওয়া যাচ্ছে স্পষ্ট। খানিকটা শরীর বেয়ে গোল গোল গড়ানো পাথর। সনৎসূর্যের মনে পড়ছে দত্তর কথা। পাহাড়টাকে জীবন্ত বলেছিল যেন। অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখল সনৎসূর্য। তেমন আলাদা কিছুই মনে হচ্ছে না তার, যেমন সব পাহাড়ই হয়, তার বাইরে তো কিছুই নয়।

— পাহাড়টা অনেক পুরোনো স্যার। আপনার ভালো লাগবেই।

আবার দত্ত। এখনও যায়নি তবে। হাওয়ার মধ্যে মিশেছিল যেন। সনৎসূর্য নিজেকে সংযত করে।

— কত পুরোনো।

— তা ধরুন পৃথিবীর যত বয়স, ততটাই।

— তোমাকে বাড়ি যেতে বলেছিলাম দত্ত।

— বাড়িতো আমার সবটাই স্যার।

— আমার কাছে থাকবার প্রয়োজন নেই আর।

— অবশ্যই স্যার। আপনি বিশ্রাম করুন। আমি আশেপাশেই থাকব। চাইলেই পেয়ে যাবেন স্যার।

সনৎসূর্য আবার ঘরের দিকে ফিরতে থাকে। মানুষটাকে অসহ্য মনে হতে থাকে বারবার। এখুনি ফোন করা দরকার, কীভাবে দত্তর মতো লোক এখানে থেকে যায়, তার চটজলদি ফয়সালা প্রয়োজন। মিসেস পামের কথা মনে হল সনৎসূর্যের। এখন নিশ্চয়ই ফ্রি আছে। অন্যথায় তাকে সময় দিতে কোনো দ্বিধা থাকার কথা নয়। ম্যাগাজিনে ছাপা মেয়েটার ফোটোর কথা মনে হল। মিসেস পাম কি তেমনই দেখতে। অতটা স্লিম নয় কিছুতেই। সনৎসসূর্য দ্রুত কি - প্যাডে আঙুল চালাতে লাগল।

—আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন মিসেস পাম?

— আপনার ফোন এলে সবসময়েই শুনতে পাই সনৎসূর্য।

মিসেস পাম জানলার পাশে বসে আছে। হালকা ঠান্ডা তবু স্লিভলেস ব্লাউজ। ফিতেটুকু ছাড়া পিঠের খোলা চামড়ায় লুটিয়ে পড়ছে ভিটামিন ডি। এ সময় ঘরে কেউ থাকে না। বুকের ভাঁজে অনাবশ্যক শাড়ির আড়ালের প্রয়োজন নেই। ওপাশে শসনৎসূর্য আজ বড়ই অস্থির। মিসেস পাম শুনে যাচ্ছে দত্তর কথা, পাহাড়ের কথা, সন্ত্রাসের কথা।

— শুনুন সনৎসূর্য, আপনি জানেন আপনার দায়িত্বটা কী। কোম্পানির এই অ্যাসাইনমেন্টটা ভীষণ জরুরি। আপনার জন্য, আমার জন্য, কোম্পানির জন্য।

— তার সঙ্গে দত্তকে এ্যাপয়েন্ট করবার সম্পর্ক কী?

— সবই তো জানেন সনৎসূর্য। জায়গাটা সেন্সিটিভ এবং দত্ত লোকাল লিডার।

— টু মাচ্ মিসেস পাম।

— আপনি বরং রঙের কথা বলুন। অন্য কথা থাক।

— রঙ সম্পর্কে আপনার কী ধারণা মিসেস পাম?

— তিনটেই আসল রং জানেন তো? রেড, স্যায়ান অ্যান্ড ইয়েলো। বাকি সবই মিক্সিং।

— আপনার কোন রঙ পছন্দ ম্যাডাম?

— আই লাভ মিক্সিং।

— যেমন?

— বাদামি।

— নিজে ফর্সা বলে?

— বিপাশা বসুকে দেখেছেন?

— বাদামি রঙ আপনার পছন্দকেন মিসেস পাম?

— ভীষণ সেক্সি।

— কবে ফ্রী থাকছেন মিসেস পাম?

— জাস্ট নাও।

ফোনটা কেটে দিল সনৎসূর্য। এই ঘরে কোনো জানলা নেই। এ. সি. মেশিন হাওয়া দিয়ে যায় ক্রমাগত। একটা মৃদু আওয়াজ গুঁড়ো গুড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। বাইরের ঘোলাটে আলো এখন এই ঘরের মধ্যে লেপটে থাকে, সনৎসূর্যের সারা শরীর পাক খায়। ঘরবন্দী মনে হয় নিজেকে। বাইরে হাওয়ায় মিশে দাঁড়িয়ে আছে দত্ত। আবার পাহাড়টাকে মনে পড়ে সনৎসূর্যের। বিছানায় শুয়ে ছিল। মিসেস পামের কথাগুলো ফিকে হতেই প্রশমিত হয় সে। দ্রুত পোশাক পাল্টে ঘর থেকে বেরোয়। তারপর টানা বারান্দা। বারান্দা পেরিয়ে লনের রোদটুকু শুঁকে নিয়ে রিসর্টের গেটের কাছে পৌঁছে যায়। সামনেই টানটান হাইওয়ে, সাঁ সাঁ ছুটে যাচ্ছে ট্রাক। সেটা পেরোতে পারলেই পাহাড়টাকে আরও ভালোভাবে দেখা যাবে। ওদিকেই কোথাও দত্তর বাড়ি। তার খিদমতগার।

— আমি জানতাম স্যার, আপনি পাহাড়ে যেতে চাইবেন। পাহাড়তো নিজেই ডেকে নেয় স্যার।

— পাহাড়ে ওঠার রাস্তাটা কোন দিকে দত্ত?

এই শহর আজকাল ভীষণ ব্যস্ত। পাঁচ বছর আগেও এমন ছিল না। সবই নাকি গ্লোবালাইজেশনের জন্য। চাকরির ক্রমাগত সুযোগ ভিড় বাড়িয়েছে দুরন্ত। টুপটাপ খসে পড়ছে একচালা - দোচালা খুপরিগুলো, এমন কি কোনোও কোথাও মুদি দোকানগুলোকে প্রাগৈতিহাসিক মনে হয়, তাদের অবাঞ্ছিত অস্তিত্বের ব্যাখ্যা নেই কোনও আর। শহরের এই দিকটায় তেমনই এক্সটেন্শান। শুনশান রাস্তার খোলামেলা কাটাকুটি। ধাঁই ধাঁই উঠে যাওয়া বাড়ি, হরেক রঙের ছোপ লাগে। আবাসন - প্রকৃতি। ড্রইংরুমে টিভির পর্দায় মানুষগুলো ভীষণ লাফালাফি করছিল। চিৎকার করে বলছিল কিছু। শোনা যাচ্ছে না তবু। প্রয়োজনও নেই তবে। জয়িতা বসেছিল সোফায়। এইমাত্র ফোন এসেছিল।

— আমার ফেরার কোনো ঠিক নেই। এই মুহূর্তে জঙ্গলে আছি। ব্যাস। এইটুকুই সংবাদ। জয়িতা কিছু বোঝবার আগেই সুইচ্ অফ এবং ফের কোনো যোগাযোগ নেই। সম্ভাবনাও কতটা আছে আর, তাও অনিশ্চিত। ভীষণ নির্জনতা এই ঘর জুড়ে। আজ সকালেই বারণ করেছে সুজয়কে। বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, সব কাচা হয়ে গেছে। ওয়াইনের আধপেটা বোতল ফেলে দিয়েছে পেছনের ভ্যাটে। এমনকি, সরিয়ে রেখেছে সুজয়ের দেওয়া ইমপোর্টেড নাইটি। সবটাই সনৎসূর্য ফিরে আসবে বলে। অথচ সে জঙ্গল থেকে শুনিয়ে দিচ্ছে অনিশ্চিত ফিরে আসার পরোয়ানা। জয়িতা ভাবল একবার, সত্যিই কি সনৎসূর্যেরই ফোন ছিল, অথবা নিছকই মজা। আপাতত সময় টুকরো টুকরো হয়ে ভেসে যাচ্ছে এ ঘর থেকে সে ঘর। কালো মেঘ সরে গেলেই দারুণ ঠাণ্ডা পড়বে। আবহাওয়া অফিসের ঘ্যানঘেনে প্রতিদিনকার পূর্বাভাষ আরও একদিনের জন্য বহাল আছে। জয়িতা নিজেও ঘোলাটে হয়ে উঠছে যেন। চারদিকে সবটাই খুব বিসদৃশ এখন। অপেক্ষা করা যেতে পারে, ততটাই, যতক্ষণ না সনৎসূর্য ফিরে আসে, অথবা সন্ধানপর্ব শুরু হতে পারে। জয়িতা নিজেকে ভেঙেচুরে দেখছে এবার। ছড়িয়ে দিচ্ছে ঘরের আনাচে কানাচে, এবং রাত পেরিয়ে গেলে ফোনের ধারাবাহিক বিচ্ছিন্নতায় আরও বেসামাল হয়ে উঠলে নিজেকে জুড়ে নিতে থাকে ফের। এখন বেশ ঠান্ডা বোধ হচ্ছে শহরে। অবশেষে শীত এসে গেল তবে। এমন আবহাওয়ায় মিসেস পাম নিজেকে আরও সাজিয়ে নেন। রোদ্দুর পড়ে পালিশওয়ালা নখগুলো চকচক করে উঠছিল। আলগোছে তুলে নিল রিসিভারটা।

— শুনুন জয়িতাদেবী। আমার সঙ্গে দিন পাঁচেক আগে যোগাযোগ করেছিলেন। তখনও অন্যরকম কিছু বলেননি। অ্যাক্চুয়ালি আমরা রঙ নিয়ে আলোচনা করছিলাম। বাদামী রঙটা যে দুর্দান্ত যৌনকাতর, সেটাই ওনাকে বোঝাতে চাইছিলাম এবং উনি আমার ফ্রি টাইম জানতে চাইলেন। মনে হয়, এর সঙ্গে জঙ্গলের কোনো সম্পর্ক আছে। আপনি বরং পুলিশের সঙ্গে কথা বলুন।

জয়িতা সেই বিশাল শহরে একা বসে থাকে। তীব্র ঘৃণায় বসেই থাকতে চায়। সনৎসূর্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। সারা শহর হুড়মুড় করে জয়িতাকে ঘিরে ধরে। ঘোলাটে ভাব কেটে এখন নীল আকাশ ঝুলে পড়তে পড়তে চারদিকের বাড়িঘর - মানুষজন - পথঘাট ছেয়ে ফেললে জয়িতা অন্ধের মতো হয়ে যায়, পথ ঘুরে ঘুরে জঙ্গলের খোঁজ করে।

— জঙ্গলে গিয়ে উনি পথ হারায়নি জয়িতাদেবী। তিনি টেররিস্টদের খপ্পরে পড়েছেন।

— কি কারণে ওনাকে ধরতে পারে?

— ওদের কোনো কারণ থাকে না ম্যাডাম। সবটাই নৈরাজ্যবাদ সৃষ্টির চক্রান্ত। দেখছেন না, কোনও মুক্তিপণও চায়নি।

—তাহলে কি হতে পারে এখন।

— আমরা খুঁজে এনে দেব ম্যাডাম।

আজকাল বাইরে গিয়ে কেউ নিখোঁজ হলেই ধরে নেওয়া হয় সে সন্ত্রাসবাদীদের কবলে। সুজয় বলেছিল, এটা কমন থিয়োরী। তাহলে ঝামেলা বেশ কমে যায়।

— তোমাকে আমার বিশ্রি লাগছে সুজয়।

— সেটাই স্বাভাবিক ডার্লিং। সনৎসূর্য না ফিরলে তোমার কানাকড়িও দাম নেই।

— তোমার গায়ে ঐ বাদামী রঙের চামড়া ভীষণ কুরুচিকর।

— তুমি আবার রঙ নিয়ে ভাবছ কবে থেকে? ওটাতো তোমার বরের প্যাশন। সুজয়কে বার করে দিয়ে জয়িতা একটা লং ড্রাইভের কথা ভাবছিল। সমুদ্রের ধার দিয়ে টানা রাস্তা। বালিয়াড়ি থেকে বালি উড়ে আসছে। জয়িতার ঠোঁটে নোনতা স্বাদ। দূরে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে। একটা পাখির মতো জয়িতা ভাসছে তখন। দুপাশে বিশাল ডানা। ছায়ায় ঢেকে যাচ্ছে সমুদ্রের ঢেউ। জলের মাথায় ভাসতে

ভাসতে ঝিনুক আছড়ে পড়ছে বালিতে। জয়িতা ঝিনুক খুঁজছে। খোলের ভেতর থেকে খুঁজে আনতে চাইছে সনৎসূর্যকে।

—চিন্তা করবেন না ম্যাডাম। স্যার ভালো আছেন। আসলে স্যারের এই জঙ্গলটাকে ভীষণ ভালো লাগছে কিনা।

— আপনি কে কথা বলছেন?

—আমি তো একা নই ম্যাডাম। আমরা।

— কোত্থেকে কথা বলছেন? সনৎসূর্য কোথায়?

— উনি এখন খুব ব্যস্ত ম্যাডাম। ঘুরে ঘুরে ভেষজ উদ্ভিদ চিনে নিচ্ছেন। জয়িতা বসে আছে চুপ করে। পনেরো দিন বাদে শুধু এইটুকুই খবর।

—ওয়েল ডান ম্যাডাম। এবারে সনৎসূর্যকে লোকেট করা যাবে।

— আপনাদের কী মনে হচ্ছে ও টেররিস্টদের কাছেই আটকে আছে?

— পুলিশদের অনেক কিছুই মনে করতে হয় ম্যাডাম। গোটা ব্যাপারটাই সাজানো হতে পারে।

— তার মানে?

— উনি হয়ত এই শহরেই কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছেন।

— মিসেস পামের ফ্রি টাইম কখন জানেন?

— রিল্যাক্স ম্যাডাম। আমাদের ভাবতে দিন। আপনি বরং কফি খাওয়াতে পারেন। শীতকালে কফি পান খুবই আরামের।

জয়িতা ভাবতে থাকে সনৎসূর্য যদি আর কখনও না ফিরে আসে। কফির কাপে টুংটাং আওয়াজ ওঠে। যদি আর ফিরে না আসে, জয়িতার তেমন কোনো অসহায়তা নেই কী আর, বরং নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেঁকে নেওয়া যায়। জানলার শার্সিতে নানা রঙের কাঁচ। বাইরের রোদ্দুরে টুকরো টুকরো ভেঙে পড়তে চায়, মেঝেতে, ভেসে যায় বাতাসে।

— আপনি কি শুধু কফি পানই করেন ইন্সপেক্টার?

পরপর দিনদিন জয়িতা কফিই বানাতে থাকে। শীত ক্রমশঃ জাঁকিয়ে বসছে। কফি পানের আরামে আরও আরও কফির যোগান মজুত হয়, ভরে যায় জয়িতার রান্নাঘর, ড্রইংরুম এবং বেডরুম। যেকোনো দিন সনৎসূর্য ফিরে এলেই খুঁজে পাবে ব্রাজিলে বাগান থেকে কিনে আনা কফির প্যাকেটের পর প্যাকেট।

ধর্মাবতার, আমি সনৎসূর্য ভরদ্বাজ। জি . এস. ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানির অন্যতম মালিক। অনেকদিন আমি এই শহরে ছিলাম না। এই শহর, যেখানে আমার কাজ, উপার্জন, বৈভব, ফুর্তি। এই শহরেই আমার সুন্দরী স্ত্রী, বান্ধবী, ব্ল্যাক মানি। তবু এই শহর ছেড়ে আমি এক অরণ্যের আশ্রয়ে ছিলাম। আমায় জঙ্গলের পথ চিনিয়েছিল ওই যে লোকটা, হাসি হাসি মুখে এখনও দাঁড়িয়ে আছে। সবাই ওকে দত্ত বলে ডাকে। আমি জানি না আর কোনও নাম ওর আছে কী না। আরও যে চারজন, ওরাই ছিল সহচর। আমার অরণ্যভ্রমণ ভীষণ আশ্চর্যের ধর্মাবতার। এই শহর ছাড়িয়ে অনেক দূরে একটা পাহাড় আছে, কালো কালো পাথর দিয়ে তৈরি। সে পাহাড়ে যাওয়া আমার বারণ ছিল, কিন্তু সে এতই জীবন্ত যে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকে। আমি এসব বিশ্বস করিনি ধর্মাবতার, তবু ওই দত্ত আমাকে শুনিয়েছিল সে কথা। আসলে বিশ্বাস ব্যাপারটা এতই আপেক্ষিক যে একের যুক্তি অন্যের কাছে মূল্যহীন। আমি এতবড় কোম্পানির মালিক, পাহাড়ের গল্পে আমার কেন আস্থা থাকবে। অথচ দত্ত আমার ভেতরে দোলাচল এনে দিল। দত্ত লোকটিও বড় অদ্ভুত ধর্মাবতার। ও হাওয়ার মধ্যে মিশে যেতে পারে, আর হঠাৎ হঠাৎ দেখা দিয়ে পাহাড়ী, জঙ্গলের গল্প শোনাত। পাহাড়টা সত্যিই বড় সুন্দর। পাথর ছড়ানো রাস্তা, অন্ধকার গুহা। নির্জন শিবমন্দির, তার ওপাশেই জঙ্গল। জঙ্গলে আমার ভীষণ ভয় ধর্মাবতার, ওখানে তো আমাদের মতো সভ্য মানুষের নিয়মকানুন চলে না। মুশকিল হল ভয় পাওয়াটাও একদমই ব্যক্তিগত। দত্ত জোর করে আমায় জঙ্গলে নিয়ে গেল। তখনই কোত্থেকে এসে গেল ওই চারজন। ধর্মাবতার, ওদের হাতে কোনো অস্ত্র ছিল না। মুখে কোনো হিংস্রতা ছিল না, এমনকি আমার প্রতি কোনো অবহেলাও ছিল না। অথচ ওদের দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। আমার কুঁকড়ে যাওয়া অস্তিত্ব দেখে ওরা হাসতে লাগল, যেন খুব মজা পেয়েছে, তারপর জানতে চাইল, সমাজে আমার প্রয়োজন কতটা? এর কোনও জবাব আমার জানা নেই ধর্মাবতার, আমি কিছু বলতে পারিনি। আমি ভাবছিলাম এরা কী আমায় মেরে ফেলতে চায় ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল আমায় নিয়ে কী করা যেতে পারে। ধর্মাবতার, আমার অনেক টাকা আছে, তাই টাকা দিয়ে ওদের কিনতে চাইছিলাম। আমি ওদের জানালাম, ফিরে যেতে পারলে ওদের জীবন বদলে দেব। ওরা বিনিময়ে আমাকে জঙ্গলের সব গাছ চিনিয়ে দেবে বলল। আমার কোনও উপায় ছিল না ধর্মাবতার। কতদিন ওদের সঙ্গে গাছের পর গাছ পেরিয়ে শুধু হেঁটেই গেলাম। ওরা আমাকে চিনিয়ে দিল মহুয়া, পলাশ, কুসুম, শিমূল, হরতকী আর অমলতাস গাছ। কত ভেষজ, আগাছা, শৈবাল, তৃণ — সব চেনা হয়ে গেলো। হাঁটতে হাঁটতে একদিন আমায় বলল এবারে জঙ্গল ছেড়ে ফিরে যাও। আমি ইমানদার লোক ধর্মাবতার, অত বড় কোম্পানির মালিকানায় আমার নাম, আমি কেন কথার খেলাফ করব। আমি জানালাম, আমার সঙ্গে গেলে তোমাদের জীবন বদলে দেব। ওরা গরিব ধর্মাবতার। ওদের দুবেলা খাওয়া জোটে না, শোয়ার বিছানা পায় না, থাকার ঘর হয় না, শুধু জঙ্গলের মধ্যে হেঁটে বেড়ায়, অথচ আমার কথা শুনে ওরা হাসতে লাগল। তারপর হাসি থামিয়ে আস্তে করে বলল, বরং এবার নিজের জীবন বদলে নাও। আমি কিছু বলতে পারিনি ধর্মাবতার, তাকিয়ে দেখলাম ওদের পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। ধর্মাবতার, এটুকুইতো আমার কাহিনি, আমার ভাষ্য।

বাড়ি ফিরে সনৎসূর্যের ঘুম পেল কফিপানের কথা মনে হল। জয়িতা তখন কফির প্যাকেটগুলো ছুঁড়ে ফেলছিল বাইরে। এভাবেই চলছিল যতক্ষণ না সনৎসূর্যের ফোন করতে ইচ্ছা হল।

— মিসেস পাম, আপনার জন্য আমি একটা বাদামি পাতকার গাছের চারা এনেছি।